

ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଉତ୍ତର ସୁଧିଧିର ଚାରି
କାଳାନ୍ତକ
ଆବୃତ୍ତି ଉତ୍ସବ-୨୦୦୫
ହନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା

୧୪, ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୫
ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସଦ ମିଲନାୟତନ
ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ବିଶ୍වବିଦ୍ୟାଲୟ

ପିଡ଼ିଏଫ୍ ସଂରକ୍ଷଣ-
କାର୍ଯ୍ୟକୁରୀ ପରିସଦ ୨୦୧୯-୨୦ (ନବମ କାଉସିଲ)
ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟ ଆବୃତ୍ତି ମଞ୍ଚ



ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟ ଆବୃତ୍ତି ମଞ୍ଚ

ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟ ଆବୃତ୍ତି ମଞ୍ଚ

ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଟେ ସୁଧିଧିର ଚାଠ-

କାଳାନ୍ତକ

ଆବୃତ୍ତି ଉତ୍ସବ-୨୦୦୫

ହନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା

୧୫, ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୫
ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସଦ ମିଲନାୟତନ
ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବୃତ୍ତି ମଙ୍ଗ

কালান্তর

আবৃত্তি উৎসব-২০০৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মন্ত্র

১৪, ১৫ মার্চ ২০০৫

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

মাহুম আহমেদ

সহ-সম্পাদক

ভাগ্যস্বরী চাকমা

আবদুল-হাত-আল-মামুন

কৃতজ্ঞতা শীকার

খালিদ আহসান

ইউসুফ মুহম্মদ

অশোক বড়ুয়া

শওকত বাঙালি

রাশেদ হাসান

ফারাক তাহের

প্রণব সিংহ

সাইফুল ইসলাম

সুমন/জামিল/নদী

অরূপ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ

ফয়েজ উদ্দিন মধু

মুদ্রণ ও বর্ণবিন্যাস

MABS

৭ বঙ্গবন্ধু ভবন (৩য় তলা), ৮ সিডি এ বা/এ,

দৈনিক আজদীর পার্শ্ব, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মুঠোফোন : ০১৭১৮৩৩০৮০, ০১৮৯৬১০৮৭৫

গুরুবৰ্ষা মূল্য : ২০ টাকা

উদ্মৰ্জ

আপন মহিমায় যাঁরা উদ্ভাসিত -

প্রয়াত মৃণাল সরকার

ও

ড. হুমায়ুন আজাদ

কথার লতাপাতা, ছন্দোহীন

ময়ুখ চৌধুরী

সূচিপত্র

কথার লতাপাতা, ছন্দোহীন	
মযুখ চৌধুরী	৫
ছন্দে মজা আছে	
মহীবুল আজিজ	৮
সুরের আগুন...	
রাশেদ রাউফ	১৩
কবিতার ছন্দ	
নীরদবরণ হাজরা	১৬
আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা - '০৫	২১

১.

বিভাগে বসে ছিলাম। সহকর্মীদের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা চলছিলো। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটি মেয়ে ঢুকে পড়লো। তাকে দেখে যে কারোই মনে হতে পারে— বিপদে পড়েছে। অবস্থা দেখে তাকে বিশ্রাম নিতে বললাম, পানি খেতে বললাম। না, খাবে না; তার উপবাসব্রত চলছে।

দু'ঘণ্টা ধরে নাকি আমাকে খুঁজছে; এবং গত তিনিদিন যাবত। ব্যাপার কি? মেয়েটি কথার ফাঁকে ফাঁকে হাঁপাচ্ছে আর দম নিতে নিতে গড়গড় করে কথা বলে যাচ্ছে। ওর কথা থেকে যা বুঝলাম,— সে একটি আবৃত্তি-সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। দিন কয়েকের মধ্যে একটা ম্যাগাজিন বেরোবে। বিষেশ সংখ্যা। বিষয় : কবিতার ছন্দ। সেটার জন্যে লেখা তার চাইই চাই।

মেয়েটিকে বিপদগ্রস্ত মনে হয়েছিলো; এখন মনে হচ্ছে— বিপদে আমিই পড়েছি। কেননা, ফরমায়েশি লেখা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আমি পারি না। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সহকর্মীদের একজন মেয়েটিকে আর একটু উসকে দিলেন। উদ্দেশ্য: মজা দেখা। বাধ্য হয়ে কথা দিলাম— মঙ্গলবার। ভাবলাম, লেখার ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার জন্যে দু'তিন দিন কম সময় নয়। কিন্তু, ভাগ্য আর কাকে বলে! লেখার কথা স্বয়ং আমিই ভুলে গেলাম। আর, মেয়েটি যথাযথ মঙ্গলবার এসে উদ্দিত হলো।— ‘স্যার, আজ মঙ্গলবার’। হা কপাল, একেই বলে মঙ্গল-বার! এবার কৃত্রিম প্রত্যয় মেখে বললাম— ‘বৃহস্পতিবার’।

২.

আজ বুধবার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল সকালে সে আসবে। হাতে কলম। মাথায় তালগোল। সিগারেট টানছি। বিষয়টা টানছে না। ছন্দ...কবিতা...ছন্দ...আবৃত্তি...ছন্দ...নিরীক্ষা...ছন্দপ্রীতি...ছন্দের নামে নাম মেয়েটির নিরলস চাওয়া...তার উপবাসব্রত...ছন্দ...গদ্যরচনা...এই সময়টায়...ইচ্ছার দুর্বলতা। গোটা ব্যাপারটাই যেন ছন্দছাড়া। কি করা যায়? কি করি!

৩.

সৃতি আর মন ছোটাছুটি করছে। কি কারণে মনে পড়ছে ঢাকার প্রভাবশালী এক কবির মন্তব্য! তিনি বলেছেন— ‘আবৃত্তি হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারি’। কথাটা আমার পছন্দ হয় নি; — বড় ঝুঢ় আর নির্মম। পক্ষান্তরে এও পছন্দ হয় নি যে, কার্ডের ওপর ফটোকপি সেঁটে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

ও রকম এক অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে। প্রচুর তালি কুড়িয়ে আবৃত্তিকার এসে বসলেন পাশের খালি চেয়ারটায়।

আবৃত্তিকারদের কাব্যমনক্ষত্রের ব্যাপারে কারো কারো সন্দেহ আছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার কৌতুহল সামলাতে পারি নি। বললাম—‘ভালো লেগেছে। কবিতাটা যেন কোন বইয়ের...?’ জানলাম যে, সে জানে না। এক সন্দেহকারীর উক্তি মনে পড়লো—‘এখানেই পাঠক আর আবৃত্তিকারের ফারাক’। কিন্তু আমি নিজেই চমকে উঠলাম, যখন জানলাম যে, কবিতাটা কার সেটাও সে জানে না! একজন ধরিয়ে দিয়েছে, সে পড়ে দিয়েছে। তারপরও, আমার সৌজন্যবোধ বলেছে, এটাকে ব্যতিক্রম রূপেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু, টিভি-তে আবৃত্তি করতে গিয়ে কবির নামটাও মুখে না-তোলা, কিংবা স্ক্রিনে না-দেখানো— এটা কতোখানি সৌজন্যসম্মত?

৪.

যাক। আমার এখনকার ভাবনা ছন্দ নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাববো? ধরে নেবো কি— ওরা ছন্দ জানে না? যদি না-ই জানে, তবে এমন কি ক্ষতি! আবার, সবাই যে ছন্দ বোঝে না, তা তো না। যাঁরা বোবেন, তাঁদের কি বোঝাবো? ওরা কি থার্ডহারের ছাত্র নাকি!... একে যতি বলে, একে অর্ধবর্তি, এটাকে ছেদ বলে, ওটাকে মধ্যখণ্ড, এটা পর্বাঙ, সেটা উপপর্ব, ওটা অতিপর্ব, বৃত্ত্বৃত্ত ইত্যাদি। এ গুলো তো গাইডমার্ক বইতেও পাওয়া যায়।

তা হলে এখন উপায়! কালকেই তো লক্ষ্মীবার।

৫.

জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। ভাবতে ভালো লাগছে— ছন্দ-বিষয়ে দলগতভাবে একটি সংগঠন এতোখানি সিরিয়াস। তবে কি আবৃত্তিকাররা এখন ছন্দোময় কবিতার দিকে ঝুঁকছেন? তবে তো সত্যেন দত্তের পোয়াবারো, — যাঁর সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন— ‘বেচারা ছন্দের পেছনে ছুটতে ছুটতে ভুলেই গেছেন যে, কবিতার ছন্দ হয়, ছন্দের কবিতা হয় না’। কথাটা নেহাত অমূলক নয়। ছোটবেলায় ‘বর্ণা বর্ণা, সুন্দরী বর্ণা’ আওড়াতে মজা লাগতো। তরুণ বয়সেও খারাপ লাগবে না, যদি পাড়ার বিচিত্রানুষ্ঠানে আগত কোনো মেয়ের নাম হয় বর্ণা।

কিন্তু, কবিতা নিয়ে ভাববার বয়স যখন হলো, তখন মনে হলো— ঝর্ণাটা যতোই সুন্দরী হোক না কেনো, কবিতাটা ততোখানি নয়। সন্দেহ নেই, ছন্দের জলতরঙ্গে ঝর্ণার তৰ্কাদেহ থার্মারি জাহাত হয়েছে;—তবে দেহই, অন্তর নয়।

ছন্দের উদাহরণ ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করার জন্যে কবিতাটা অপরিহার্য। সেই দৃষ্টিভঙ্গ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়’ শীর্ষক কবিতাটা অপ্রয়োজনীয়। এখানেই প্রশ্নটা উঠতে পারে,— আবৃত্তি করবোটা কি? — ছন্দ না কবিতা? স্বীকার করি, প্রকৃত কবিতার সঙ্গে ছন্দের বিরোধ নেই; যে রকম নর্তকীর সঙ্গে নৃপুরের। নাহ, ঠিক বলি নি। কেননা, তবলা ছাড়া নাচ চললেও, তালছাড়া নাচ হয় না। কিন্তু, শাস্ত্রীয় ছন্দ ছাড়া কবিতা হয়। কবিতার প্রধান লক্ষ্য ছন্দোময় হওয়া নয়, প্রকৃত কবিতা হয়ে-ওঠা। কিন্তু, ছন্দই যদি প্রধান হয়ে ওঠে,

তবে তো শিশু-শ্রেণীর নামতা-ক্লাসে হরহামেশাই বৃন্দ-আবৃত্তি শোনা যাবে। ভুল বুঝবেন না। আমি ছন্দবিরোধী নই। হয় তো ছন্দ কর জানি, তাই বলে কর্ম মানি না। তবে, নামতা, স্প্রে-গান এবং কবিতার পার্থক্য আমি বুঝি। বুঝি বলেই, ছন্দোময় কবিতাকে নাটকের ডায়লগের মতো উচ্চারণ করাটা আমার পছন্দ নয়।

৬.

অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, আবৃত্তির ব্রহ্মে ‘আবৃত্তিযোগ্য কবিতা’-রূপে এক ধরনের শ্রেণীকরণ ঘটেছে। এটা কবিদের কাছে, এমন-কি কবিতা পাঠকদের কাছেও কতোখানি প্রত্যাশিত? যিনি প্রকৃত কবি, কবিতারচনার সময় কি তিনি তথাকথিত ‘যোগ্যতা’র ব্যাপারটাকে আদৌ মাথায় রাখেন? না রাখা উচিত? ‘সিনেমাউপযোগী’ উপন্যাস-রচনার কিঞ্চিৎ প্রবণতা নীহারঞ্জন গুপ্তে পরিলক্ষিত হয়েছিলো। অথচ, সিনেমার জন্যে না লিখলেও, শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পই সিনেমা হয়েছে। শরৎচন্দ্র জোর করে সিনেমাটিক ট্রিটমেন্ট আরোপ করেন নি তাঁর লেখায়। পক্ষান্তরে, ‘উপযোগিতা’র প্রতি অতি মনোযোগিতাহেতু নীহারঞ্জনের অনেক লেখাই অর্থবান হয়েছে বটে, কিন্তু অর্থবহ হয় নি।

আমার বিশ্বাস, আবৃত্তিযোগ্য কবিতারূপে কিছু লেখা হয় না। লেখা হয় কবিতা। আবৃত্তিকাররা সুবিধা অনুযায়ী ‘যোগ্য’ (!) কবিতারূপে কিছু কিছু রচনা বেছে নেন মাত্র। কিন্তু, এ-ও আমার বিশ্বাস যে, কঠস্বরের মধ্য দিয়ে যিনি কবিমনকে অনুবাদ করতে শিখেছেন, তাঁর পক্ষে দুরহ কবিতাকে শ্রোতৃগ্রাহ্য করে তোলা কঠিন নয়। না পারার তো যুক্তি দেখি না। কবিতা তো ছাপা হচ্ছে এই সেদিন থেকে। তার আগে কি আজকের দিনের অর্থে পাঠক ছিলো? না, ছিলো না। তখন একজন পড়তো, দশজন শুনতো। শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিলো আনপড়, নিরক্ষর। আজকের শ্রোতারা অনেকেই শিক্ষিত এবং অনেকে শিক্ষিত।

এই সব শিক্ষিত শ্রোতাদের অনেকেরই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্নটা এ রকম: যে পরিমাণ কবিতা তাঁরা শুনেছেন, সেই পরিমাণ পড়েছেন কি? যদি না পড়েন, তা হলেও জিজ্ঞাসা জন্মায়— এঁরা কি কবিতাপ্রেমিক না আবৃত্তিপ্রিয়?

বলার দরকার নেই, — কথাগুলো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাঁরা কি এই দোহাই পাড়বেন যে,— এখন অডিওভিজুয়েল যুগ, পারফর্মিং আর্টের যুগ; কষ্ট করে কবিতাপড়ার চেয়ে শোনাটাই সহজ! এই সহজপাঠ যদি কবিদের প্রভাবিত করে, তা হলে কবিতাশিল্পের কি দশা হবে?

— এ মুহূর্তে আমার চিন্তা আর কোনো ছন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। পরে দেখা যাবে। প্রথিবীতে আরও মঙ্গলবার আসবে, আরও বৃহস্পতিবার আসবে।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ছক্ষে মজা আছে

মহীবুল আজিজ

আমার স্কুলপড়ুয়া ছোট ভাইটি তখনও সনেট কি বস্তু জানত না । একদিন উভেজিতভাবে আবিষ্কারের ঢংয়ে আমাকে একটা রচনাংশ দেখিয়ে বলল, দেখো কি মজার ব্যাপার, যেভাবেই গনো ১৪ । ১৪ লাইন ১৪ অক্ষর ! মজা না ? দেখলাম ওর হাতে আমার পড়ার টেবিলে রাখা মধুসূনের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ । বললাম, বাপু ১৪ই পাবে, ১৩ বা ১৫ পাবেনা । ও বলল, কেন ? আমি বললাম ১৪ কে খুব হিসেব করে ঢোকানো হয়েছে, ১৪ই থাকবে এবং আজীবন থেকে যাবে । তবু সে বলল, বেশ মজার তো ! আসলে সে মজা পেতো প্রাতমিলে । একবার পড়ার কবিগানের আসরে গরীব চারণকবিকে আমি ৫টি টাকা বখশিস দিতেই সে নিম্নোক্ত পঞ্জিজোড়ায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় আমাকে-

“মেনি থ্যাংকিউ, মেনি থ্যাংকিউ, মেনি মেনি গুড ।

বড় মিয়া দিছে আমায় পাঁচ ট্যাকার লুট ॥”

লুট মানে নোট – কবিটি উত্তরবঙ্গীয় কোন জেলার আর বড় মিয়া মানে আমি । এই উপস্থিত মিলের চমৎকৃতিতে সঙ্গে থাকা আমার ছোট ভাইটি যারপরনাই আহ্বানিত বোধ করে ।

মিল বাড়তে থাকলে আমার ভাইটির আহ্বানও বেড়ে যায় । সে ভাবে ছন্দমিলের প্রতিভাই সেরা, কবিতার বেলায় । তাকে যখন প্রচীন কাব্য চর্যাপদ থেকে অনুপ্রসাসহ প্রান্তমিলের পংক্তি শেনাই তার আনন্দ দেখে কে । কিন্তু জীবনানন্দ দাশ থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আমি বিপত্তিতে পড়ি । যেমন :

“চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা ।

মুখ তার শ্রাবণ্তীর কারুকার্য...”

‘র’-এর অনুপ্রাস বুবাতে পেরেও কবিতাটিতে ঢোকা সন্তুষ্পর হয় না তার পক্ষে । বলল, কঠিন ! তখন শ্রাবণ্তী-বিদিশা এইসব তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় কিন্তু অন্ধকার কাটে না । কাজেই আমাকে বলতে হলো কবিতা মানে ছন্দ আবার মিল-ও কিন্তু কবিতা মানেই শুধু ছন্দ আর শুধু মিল নয় । যা বলতে চাই তা যে সবসময় ছন্দে-মিলে কুলাবে তা নয় । কবিতা কখনও-কখনও কবির নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়ে বেয়াদবিসুলভ আচরণও করতে পারে । সেই বেয়াদবিটাকে অবশ্য নিয়ন্ত্রণ খানিকটা করা যায় যাতে ঠিক বেয়াদ নয় তাকে বিদ্রোহী-বিদ্রোহী মনে হয় । ধরা যাক, মাইকেল মধুসূন দন্ত । এত তার পুঁজি, এত অভিজ্ঞতা, এত বলবার কথা যে প্রান্তমিলে

কুলায় না । বাধ্য হয়ে যেমন খুশী তেমনি যতির আশ্রয় নিলেন । আমার যেখানে খুশি আমি থামব । থেমে ফের দম নেব, তারপর পুরো রাস্তাটা মাপব । তিনি বললেন, “এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিশাদে, জানিনা কেমনে আসি লক্ষণ পশিল
বক্ষপুরে ।”

পয়ার পয়ার ভাব কিন্তু পয়ার নয় । আমার তো মনে হয় এতে বরং গদ্যের ভাবটাই প্রধান । আমি বহু বড়-বড় কবিতামৌদীকে দেখেছি যাঁরা মধুসূনকে ভয় পান, বলেন, বুঝিনা ! মিল নেই, দোলা নেই । ছোটবেলায় আমরা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে পড়তাম, “বাঁশ-বনের কাছে, ভুঁড়ো শেয়ালী নাচে ।” সেই দোলার প্রভাব কাটতে সময় লাগে ।

এটা ঠিক, মিলে আনন্দ আছে । চমৎকার মিলের ঘটনায় অনির্বচনীয় আনন্দ হয় । জীবনের প্রভৃত আনন্দকে মিলের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনার প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষণীয় । কিন্তু বহু দুঃখকষ্ট বেদনার কবিতা আছে যেগুলি চমৎকার প্রাতমিলযুক্ত । তাছাড়া দুঃখকষ্ট যন্ত্রণাকেই নানাবিধ অলংকারে সাজিয়ে কবিতায় দেখতে কিন্তু আমাদের খারাপ লাগে না । মনে হয় যেন পরমণা সুন্দরী রমণীরা ক্রন্দন করছে । সুন্দিনাথ দন্ত তো কাব্যের নামকরণই করলেন ‘ক্রন্দসী’ । আবার মিলে আসি । ফরাসি কবি মালার্মে তো মিলের এমন ভক্ত যে কবিতায় সঙ্গীতের ব্যঙ্গনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি । তাঁর ধারণা ব্যবহৃত ধৰনি রচয়িতার গুণে এমন ধৰ্মতরী হয়ে উঠতে পারে যে তা থেকে অতিলোকিক ব্যঙ্গনা সন্তুষ্ট । কি জানি লাতিন, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইতালিয় প্রভৃতি ভাষায় হয়তো তা সন্তুষ্ট । অসন্তুষ্ট বা বলি কি করে । পৃথিবীতে নাকি এমন দেশও আছে যেখানে চিঠিপত্র লেখা হয় পদ্যে, কবিতায় । নিকারাগুয়ায় পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যার চিঠিতেও পদ্য আছে । অবিশ্বাস্য মনে হয় কিন্তু সত্য । আমি তো ভাবতেই পারি না । বাবা কিংবা মা’কে ‘কেমন আছো’ লিখেই তো আমি আটকে যাবো ছন্দ মিলের চিঞ্চায় । দেখা যাবে মিল হয়তো পেয়েছি কিন্তু যা বলতে চাই তা ভুলে গেছি ।

সে থাক, আমার ভাইটির একটাই কথা, ছন্দে মজা আছে । ছন্দে সুষমা হয়, শৃঙ্খলা হয়, বিন্যাস হয় – সবচেয়ে বড় কথা একটা ব্যালেন্স হয় । কিন্তু ছন্দ তো সবসময় পূর্বাপর এক জায়গায় থাকে নি । একই কবিতায় ছন্দ বদলে গেছে, ছন্দ নানাভাবে কথা বলে উঠেছে । একেকটুকু পথ একেকভাবে হাঁটছে । সেটাও ছন্দেরই খেলা । নজরলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কথা বলা যায় কিংবা জীবনানন্দ দাশের ‘অবসরের গান’ । একই কবিতায় ছন্দের মাপ পূর্বাপর এক নয় । এই কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত দেখি

: (1) শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে

অলস গেঁয়োর মত এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;

(2) চারিপাশে বনের বিস্ময়,

চৈত্রের বাতাস

জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন !

(৩) দোনলার শব্দ শুনি ।

ঘাইমৃগী ডেকে যায়,

এই যে ছন্দ একভাবে শুর হয়ে বদলাতে-বদলাতে চলল সেটা কার কথায় – নিশ্চয়ই কবির কথায় । কিন্তু লেখার আগে বলে দেওয়া অসম্ভব ছন্দটা কীভাবে এগোবে, পথ কাটবে, হাঁটবে না লাফ দেবে । সনেটে সেটা বলা যায়, ত্রিপদীতে বলা যায় । এখনই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত'র ‘উদ্বাস্ত’ কঁবিতার কথা মনে পড়ল । কবিতাটিকে তাকিয়ে দেখতেও উদ্বাস্ত-উদ্বাস্ত লাগে । ছোট-বড়, ভাঙা-ভাঙা, কাটা-কাটা, হাঁটা-দৌড়ানো – এরকম । ফলে ছন্দে প্রান্তমিল, আদ্য-মধ্য ইত্যাকার মিল-মাপ ছাড়াও তার একটি আবয়বিক উপস্থিতির ব্যাপারও দাঁড়িয়ে যায় ।

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সান্তিয়াগো’র মাছ’ বেরোলে ছোট ভাইটি খুব রঞ্জ হলো আমার ওপর । কেন ? আমি সার্হিত্যের ছাত্র, কবিতার অনুরাগী পাঠক কিন্তু আমার কবিতায় ছন্দ উধাও । বইতে ৪০টি কবিতার ৩৯ টি গদ্যজাত, আর হারাধনের ১টি ছেলে স্বরবৃত্তে । ছন্দের এমন করণ দশায় আমার ভাই আমার কাব্য-ভবিষ্যতের সড়ক একরকম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মত দিল । বললাম, লেখা যদি ছন্দে আসতে না চায় তাকে আনি কি করে । ও বলে, উহু তোমার আনবার ইচ্ছে নেই, তুমি চাও কবিতা । হড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ুক তোমার ঘরে । কি জানি ! আমার অবশ্য ড্রাইভেনকে মনে পড়ে যিনি গদ্যের মধ্যেও ছন্দের সুষমা দেখতে পান । ছন্দহীন বা গদ্যছন্দের পথে হাঁটিবার একটা অন্যতর উদ্দেশ্য সুষ্ঠ ছিল আমাতে । অতি-আবেগ, তুলতুলে ভাব, মাঝে-মাঝে মশ্নতাকে প্রত্যাহার করা । অনেকটা এলেন গিসবার্গের মতন । ‘আমেরিকা’ নামধেয়ে কবিতা থেকে কটা লাইন অনুসরণ করি-

“America when will we end the human war ?

Go fack yoursclf with your atom bomb.

I don’t feel good don’t bother me.

I won’t write my poem till I’m in my right mind.”

এরকমই নির্ভার, আবেগমুক্ত কঠস্বর যেন শুনতে পেয়েছিলাম আবদুল গণি হাজারী’র ‘কতিপয় আমলার স্তৰী’তে –

“ আমরা কতিপয় আমলা স্তৰী

তোমার দিকে মুখ ফেরলাম

হে প্রভু আমাদের তাণ করো

বিশ্রামে বিধ্বন্ত আমরা

কতিপয় আমলার স্তৰী”

আমার উদ্দেশ্য হয়তো খুব নিটোল ছন্দেও প্রকাশ করা যেত কিন্তু আমি সেপথে যাইনি । ক্রমশ: ছন্দ এবং ক্ষেত্রবিশেষে মিল-এর দিকেও আমি আসি । কিন্তু কাব্যের ব্যাপারে, মূলত: গদ্যের লোক বলে কিনা জানিনা, কাব্যে অহেতুক কাব্যময়তা স-

যোজনের দিকে হাটতে ইচ্ছে জাগে না । আমার ধারণা পংক্তির অবস্থান বা কাব্যময় শব্দের চাইতেও কবিতার মধ্যকার পরিস্থিতিটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আর যা বলা হচ্ছে সেটার ভিত্তি দুর্বল হলে চমৎকার ছন্দ বা অলংকারে কি ফায়দা । আমার ধারণা সঠিক কি ভুল জানি না কিন্তু একটা বিশেষ ছন্দের দেখা আমি পেয়ে যাই যাতে আমার দু’টো উদ্দেশ্য সাধিত হয় । এক. কবিতা ছন্দে রচিত হবে – এক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্ত মূলত: এবং দ্বিতীয়ত: কবিতা অতিরিক্ত লাবণ্যময় মনে হবে না বরং কবিতাকে খানিকটা গদ্যের মতনই দেখাবে । আমার নবম কাব্যগ্রন্থ ‘এই নাও দিলাম সনদ’ এবং দশম কাব্যগ্রন্থ ‘আমরা যারা স্যান্যাটরিয়মে-’তে এই দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি চালাই । পরীক্ষার ফল আমার বিচারে আশানুরূপ । দ্রষ্টান্ত দিয়ে দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের বিশে-ষণ করা যাক । ‘যা কিছু প্রকাশ্য’ কবিতার শেষ দুই পংক্তি –

“যা-কিছু প্রকাশ্য তা-ই সব সত্য নয়, কিছু থাকে গুণ্ট;

বাইরে কণামাত্র দেখি যদিও, সত্য থাকে আইসবার্গে সুণ্ট ।”

কবিতাটিতে আগাগোড়া প্রান্তমিল অনুসৃত হলো দীর্ঘ প্রবহমানতা এবং গদ্যের চাল দিয়ে এর অতি-কাব্যিকতাকে পরিহার করা হয়েছে এবং এর মধ্যে গদ্যের মেজাজ সংযোজন করা হয়েছে । আমার ছোট ভাই বলে, তুমি পর্ব ভাগ করে দেখাও । আমি বলি প্রতি পংক্তিতে পর্ব দু’টি করে, ১০+১০ এরকম । সে বলে, এমন পর্ব বিভাগের কথা তো শুনিনি । আমাকে বলতে হয়, শোননি, এখন শোন । আমার যদি প্রতি পংক্তিতে মাত্র দু’টি করে ১০ মাত্রার পর্বে কাজ চলে যায় সমস্যা কিসের !

আরেকটি উদাহরণ – ‘তোমার আলোক’ । শুরুটা পড়তে মনে হয় স্বরবৃত্তের মতন কিন্তু ১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত-ই :

“তোমার আলোক পড়েছিল আমার অন্ধকারে, হঠাৎ

তাতে গেল খুলে অন্ধ কারা । অন্ধ আলোর আকার দেখি

চতুর্দিকে, সে-আকারে অন্ধ হয়ে বসি আলো-কারাগারে ।”

দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে বিস্মিত হবার কি আছে । সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার ছন্দের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়ই । মন্দাক্রান্তা অবশ্য মাত্রাবৃত্তে অক্ষরবৃত্তে নয় । একই মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লাইন মাত্রাবৃত্তের চাইতে দীর্ঘ দেখাতে পারে । কেননা, মাত্রাবৃত্তে বহু খাঁজ আছে যেখানে মাত্রার লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ বোঝা যায় না । সেদিক থেকে অক্ষরবৃত্ত অনেকটা সরল । যাহোক, মন্দাক্রান্তা ছন্দের মূল পর্ববিভাগ হচ্ছে - ৮+৭+৭+৫ । বুদ্ধদেব সেটা নিতেই পারেন । সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত পার্থক্য রয়েছে, সংস্কৃতে অনুষ্ঠার ও বিস্রগ শব্দমধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বাংলায় তত অনুষ্ঠার- বিসর্গ নেই ।

কথা হচ্ছে ছন্দ বিষয়ে আমার নিজস্ব ধরণ বা উদ্ভাবনা এমন আহামরি কিছু নয় যে

এ-নিয়ে বগল বাজানো বা বাকোয়াজি'র প্রয়োজন রয়েছে। আসলে ছন্দের যেসব প্রতিষ্ঠিত-প্রচলিত ভঙ্গি আছে সেগুলোতে যে চিরকাল কাজ চলবে তা মনে করার কারণ নেই। আমাদের সমাজ-জীবন-বাস্তবতা সব বদলে গেছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই বদলকে ধরবার জন্যে স্বকীয় ভাবনার মত, বিষয়ের মত আঙ্গিকেরও প্রয়োজন রয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ হতে পারে তেমন একটি আঙ্গিক। মনে পড়ে 'আমি' বা 'অহং'-নির্ভর হাইটম্যানের কবিতাকে কিভাবে ছাড়িয়ে যান নজরগুল। আবার একই 'আমি'-কেন্দ্রিক কবিতাকে ভিন্ন ধরনে সাজিয়ে বিষয়ে-ভাবনায় এবং ছন্দের আঙ্গিকে গেঁথে তোলেন হৃষায়ন আজাদ তাঁর 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে' কবিতায়।

ছন্দে মজা আছে। ছন্দ মানেই নৃত্যপরতা নয়, এগিয়ে যাওয়া। ছন্দ দ্রুতও হতে পারে, ধীরও হতে পারে। না দৌড়ে একটু থেমে-থেমে চলাটাও ছন্দের নিয়ম। থেমে যাওয়া মানে যতি নয়, সেটা হতে পারে পুনর্যাত্মা-ও। ছন্দ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে খুব দ্রুত আমার কথাগুলো মনে পড়ল। আত্মপরতার বাহ্যিক উত্তোলিত হলে ক্ষমাগ্রাহী। তবে, আমাদের কবিতার জগতে ছন্দ নিয়ে ভাববার আরও জন আছেন। ছন্দ নিয়ে তাঁদের স্বকীয় প্রকাশমানতায় আমরা চমৎকৃত। বোঝা যায় ছন্দ সামনের দিনগুলিতে আরও বদলাবে।

০৮ | ০৩ | ২০০৫

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সুরের আঞ্চল...

রাশেদ রউফ

১.

কবিতাকে কি গান বলা যায় ? বলতে কি পারি কবিতা গানের মতো মানুষের হন্দয় স্পর্শ করতে পারে, চুক্তে কি পারে মানুষের মস্তিষ্কে, মনে ?
কবিতা গান নয়, কিন্তু গানের মতো তার প্রাণ আছে, আছে সুর; সে পারে মানুষের হন্দয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে, চুক্তে পারে মনে, মন থেকে মনান্তরে। কাব্যাতিহাসের প্রারম্ভে কবিতা কখনো লেখা হতো না, গানের মতো সুর করে গাওয়া হতো। তাই সেই সময়ে রচিত কবিতাগুলোকে কখনো বলা হতো কবিতা, আবার কখনো বা গান। গানের আবহ থেকে কবিতাকে সরিয়ে আনার জন্য আমাদের আধুনিক কবিরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। মাইকেল মধুসূন্দনই প্রথম কবি, যিনি ছন্দ-বৈচিত্র্যের প্রথম দরজা খুলে স্বাগত জানিয়েছিলেন অন্যকে। 'তাঁর হাতে তৈরি ছন্দের সবচেয়ে বড় লক্ষণ, সুরের ছন্দ থেকে কবিতাকে তিনি কথার ছন্দের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন' [প্রথম দরজা: শঙ্খ ঘোষ]। মধুসূন্দন ও তাঁর পরবর্তী কবিদের সনিষ্ঠ আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কবিতা আর গানকে চেনার অবকাশ পাচ্ছি আলাদাভাবে, স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে। তবে কবিতাকে গান এবং গানকে এখন কবিতা হিসেবে না বললেও গানের আর কবিতার উৎস, উদ্দেশ্য এবং মনকে তুষ্ট করার ক্ষমতা কিন্তু এক ও অভিন্ন।

২.

ছন্দ একটি বিজ্ঞান। গণিতের সূত্রের মতো এতেও রয়েছে কতিপয় সূত্র। সূত্র ধরে এগুলে পারলে অক্ষের সমাধান যেমন নিশ্চিত, তেমনি ছন্দের সূত্রমতো অহসর হলে কবিতায়ও সৃষ্টি হবে একটি তাল, সৃষ্টি হবে একটি সুর। সূত্রটা ধরে রাখতে পারাটাই মুখ্য বিষয়।

ছন্দ কোথায় নেই ?

ছন্দ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। ছন্দহীন পৃথিবী অচল। মানুষ যে হাঁটছে, তাতে ছন্দ আছে; তার কথা বলার মধ্যে ছন্দ আছে। কাক যে কা কা করে ডাকছে, কোকিলের যে কুহ কুহ রব, শেয়ালের যে হুক্কাহুয়া ডাক, বিঁ বিঁ পোকার যে বিঁ বিঁ স্বর— সবখানে রয়েছে ছন্দ। তা হয়তো কোথাও সুনিয়ান্ত্রিত, আবার কোথাও অনিয়ন্ত্রিত। কোথাও সুনিয়মিত, আবার কোথাও অনিদিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে, বিশ্বজগতে সমস্ত সৌন্দর্যই সে নিয়মে সৃষ্টি

হয়েছে। একটা সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্য দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি।'

ছন্দ এমন এক অনিবার্য মাধ্যম, যা থেকে কবিতাকে আলাদা করা যায় না মোটেই। আবাদুল মাল্লান সৈয়দ বলেছেন, 'চৈতন্যহীন শরীর বা শরীরহীন চৈতন্যের মতো ছন্দহীন কবিতা বা কবিতাহীন ছন্দ সোনার পাথরবাটি মাত্র। কবিতা থেকে ছন্দকে পৃথক করা যায় না, ছন্দ থেকে কবিতাকেও আলাদা করা অসম্ভব। সেদিক থেকে ছন্দ বিচার কবিতারই বিচার, কবিতার বিচারেও ছন্দের আলোচনা অবশ্যস্থাবী।' এখানে বলে রাখা ভালো যে, শুধু ছন্দের টুং টাঁ অনুকরণে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি শুধু ভাব ও আবেগের প্রাণহীন প্রকাশও কবিতা নয়। ছন্দ, কথা, ভাব, আবেগ, চিত্রকল্প-সবকিছুর সমন্বয়েই সৃষ্টি হয় এক একটি কবিতা।

৩.

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হলেও তার রেশ ফুরিয়ে যাবে না। তার কোন্ দিক আমাদের আলোড়িত করে, অভিভূত করে, কাছে টানে? সে কি তার শব্দ, বক্তব্য, আঙ্গিক নাকি অন্য কিছু? বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় - 'আমার এক এক সময় মনে হয় যে, কবিতা যে আমাদের এমনভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করে সে তার ধ্বনিরই প্রভাবে, অর্থ-গৌরবে নয়। আমরা দেখেছি, সুর-ধ্বনির অভাবে কতো কবিতা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ সেই কবিতাগুলোতে এমন বক্তব্য বা এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা পাঠকের মগজকে নাড়া দিতে সক্ষম।' সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়া হয়ে যাওয়ার পরেই মনের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে অপূর্ব বিস্ময়; নিরেট আনন্দ। কিন্তু আনন্দ পাওয়ার দীর্ঘ পথটি পার হওয়ার জন্যে পাঠককে ধরে রাখার ক্ষমতা কবিতাটির মধ্যে থাকতে হবে তো! ছন্দের বৈচিত্র্য রূপের বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রিনিকেতনে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন : 'বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনই সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাঢ়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ। সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।' অনেকে গদ্যাশ্রিত কবিতা দেখে মনে করে যে, তাতে ছন্দ নেই। সেটা ভুল। ছন্দ অবশ্যই থাকে। তা হয়তো গানের সুর নয়, লিলিত লাবণ্য নয়; যে ছন্দ আছে 'আমাদের কথা-বলার প্রবহমানতায়, আমাদের স্বরের উথানপতনে।' গদ্য কবিতাতেও সঞ্চার করা হয় অন্তর্গত ছন্দের রূপ।

৪.

'কবিতার ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস- বলেছিলেন লুই আরাগঁ। টেকনিক কী? মান্নান সৈয়দের ভাষায়- 'টেকনিক একই সঙ্গে কবিতার শাসন এবং মুক্তি। শাসন এজন্যে দরকার যে আবেগ বাধাবন্ধন হয়ে ওঠে। শাসন-বারণহীন আবেগের উচ্ছাসের স্রোত কি কবিতা?' টেকনিক বা আঙ্গিকে বৈচিত্র্য না থাকলে পাঠক ধরে নিতে পারে যে, ক্রমাগত একই ধরনে একই কথা বলা হচ্ছে কবিতায়। সেই বৈচিত্র্যের প্রধান ভূমিকায় থাকে ছন্দ। যার যত বেশি দখল, তিনি ততো বেশি সফল।

৫.

আবৃত্তিশিল্পী, যাঁদের আমি খুব ভালোবাসি; তাঁদের দুঃহাতে থাকে দুঁটি অস্ত্র। একটা স্বর, অন্যটা সুর। 'স্বর' অনেকেরই আয়তে থাকে। সংবাদ পাঠক, অনুষ্ঠান যোৰ্ষক ও উপস্থাপকের প্রধান অবলম্বনই তো 'স্বর'। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই নিয়ন্ত্রণে থাকে না 'সুর'। সুর ও স্বর দুটোই নিয়ন্ত্রণে থাকে আবৃত্তিশিল্পীর। আমরা সবাই জানি যে, গান রচনা করেন গীতিকার, কঠশিল্পী তা পরিবেশন করেন; কিন্তু এই দু'জনের মধ্যে আরেকজনের মুখ্য ভূমিকা থাকে, তিনি হলেন সুরকার। সুরকারই শিল্পীর কঠে তুলে দেন সুর। অন্যদিকে, কবি এবং আবৃত্তিশিল্পীর মাঝখানে সময়য় ঘটানোর জন্য কোনো ব্যক্তি থাকে না। এখানে 'সুরকারের' ভূমিকা পালন করতে হয় আবৃত্তিশিল্পীকেই। তাই একজন কবির চেয়ে একজন আবৃত্তিশিল্পীকে অধিক ছন্দসচেতন হতে হয়। তাঁরা যখন আবৃত্তি করেন, তখন ইন্দ্রিয়ের সব ক'টি চাকা যেন সচল হয়ে ওঠে, কথা ক'য়ে ওঠে নানা ভাবনা, জাগত হয় শিল্প-চৈতন্য। মনে হয় আবৃত্তির মধ্যেই কবিতার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শেষ করি : 'মনে হয় কবিতা যখন ছাপা হতো না, তখনই তার স্বরূপ উজ্জ্঳ ছিল; কারণ কঠে আবৃত্তিতেই ছন্দের বিশেষত্ব ভালো করে প্রকাশ পায়। ছাপায় আমরা চেখ দিয়ে কবিতাকে দেখি, তার পঞ্জি, গঠন লক্ষ করি। মনে মনে ধ্বনি উচ্চারণ করে কবিতাকে সংস্কার করতে আমরা আজকাল শিখেছি। কিন্তু কবিতা নিঃশব্দে পড়ার বন্ধন নয়, কঠস্বরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভালো করে প্রকাশ পায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

লেখক : কবি ও ছড়াকার এবং সাংবাদিক, দৈনিক আজাদী

কবিতার ছন্দ

মীরদৰণ হাজৱা

কবিতার পাঠ করতে গেলে যে ছন্দবিশারদ হতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে কিছুই জানব না, এমন ভৌগোলিক প্রতিজ্ঞা করে বসলে, কিছুতেই মনোহর কবিতা পাঠ সম্ভব নয়। অতএব যত সংক্ষেপে ও সহজে কাজ চলবার মত একটুখানি ছন্দজ্ঞান গড়ে নেওয়া যায়, আমরা তাই করব।

গদ্যে যতিশালি থাকে অনিয়ন্ত্রিত; কিন্তু কবিতায় নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে দুই যতির মধ্যে যে এক একটা পর্ব তার মাপ সুনির্দিষ্ট হয়। প্রশ্ন তুলতে পারা যায় যে পর্ব মাপা হয় কিসে ? তার মাপের ওজনটা কি ? পর্ব ত দাঁড়িপাল-য় ওজন হয় না। এর উত্তর হচ্ছে : পর্বের ওজন করে কান। পর্ব ওজনের পরিমাপ হচ্ছে ‘মাত্রা’।

মাত্রা কি ? সবচেয়ে ছোট ধ্বনি উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে, তাকে বলা হয় মাত্রা বা একমাত্রা। মৌলিক এবং লঘু স্বরগুলি উচ্চারণ করতে সবচেয়ে কম সময় লাগে। অতএব এদের ওজন ‘একমাত্রা’। কিন্তু গুরু ও যৌগিক স্বরগুলি উচ্চারণে সময় লাগে দ্বিগুণ। অতএব ‘দুইমাত্রা’।

একমাত্র : অ, ই, উ, খ,

দুইমাত্রা : আ, ঈ, উ, এ, ঐ, ও, ঔ

বাঙলা ছন্দে ব্যঙ্গনবর্ণগুলির ব্যবহার বিচিত্র। আমরা সবাই জানি, ব্যঙ্গনবর্ণ কখনো স্বরবর্ণের সাহায্যে ছাড়া উচ্চারিত হয় না। কিন্তু একটি স্বরের সাথে কখনও একটি, কখনও বা দুটি ব্যঙ্গন যুক্ত হয়। সাধারণভাবে ব্যঙ্গনবর্ণের সংখ্যা অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা গোনা যায় যেমন :

হিন্দু=হিন্দু=হ ইন্দু=ইন্দু : অর্থাৎ এই শব্দটির ‘হিন্দু’ হল দুই মাত্রা, ‘দু’ হল এক মাত্রা। মোট তিনমাত্রা।

এই জাতের ব্যঙ্গনের দুটি নামও আছে।

হিন্দু=ব্যঙ্গনান্ত (closed)=দুইমাত্রা

দু=স্বারান্ত (open)=একমাত্রা।

আমরা যে কোন কবিতায় যতিপাত করলে দেখব, প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা একটি নিয়মে সাজান হয়েছে। এই নিয়মটাই ছন্দের মূল কথা। এখানেই রয়েছে কবিতার স্পন্দন। এখানেই কবিতার সাথে গদ্যের ফারাক। অতএব এই নিয়মটিকে যদি কবিতা-পাঠের সময় স্পন্দিত না করতে পারা যায় তবে কবিতা-পাঠ ব্যর্থ হবে। আধুনিক গদ্য কবিতায় এলতির ব্যক্তিক্রম দেখা যায়।

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ :

এক একটি কবিতার জন্য কবি এক এক প্রকার ছন্দ বেছে নেন। কিন্তু কেন ? এক ছন্দে, এক এক ভাব ভাল ফুটে ওঠে। ভাবের সাথে সমতা রেখে কবির মনে ছন্দ দুলে ওঠে। তাই কবিতার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে গেলে ছন্দের চরিত্রটি বোঝা দরকার।

বাঙলায় মূলত তিন প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হয়।

(ক) ছড়ার ছন্দ : আমাদের সবচেয়ে চেনা যে ছন্দটি ছেলেবেলা থেকে আমাদের মনে দোলা জাগিয়ে আসছে, তাকে বলে ছড়ার ছন্দ। আমাদের দেশের তাবৎ ছড়া এই ছন্দের রচিত। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর গতি খুব চটুল। খরস্তোতা নদীর মত তরতর করে বয়ে চলে এই ছন্দ। অতি আনন্দ, চঞ্চলতা, ছেলেমানুষি ইত্যাদি এ ছন্দে ভাল। তাই এ জাতীয় ছন্দে যে কবিতা রচিত হয়েছে তা পাঠ করতে গেলে কঠে এই চঞ্চলতা আনতে চাই।

এই ছন্দে রচিত কবিতা পাঠের সময় মনে রাখতে হবে, এর অন্য নাম শাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। এর প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষর একটা প্রবল ঝোঁক পড়ে। আর আগে আমরা অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা গুণবার যে নিয়ম শিখেছি তা এ ক্ষেত্রে অচল। কবি খুশিমত কখনও দুইমাত্রা শব্দকে একমাত্রা করে তুলেছেন, কোথাও-এক মাত্রাকেই করে তুলেছেন দুই মাত্রা। অথচ, আশ্চর্য, এতে না হয়েছে ছন্দের ক্ষতি না নষ্ট হয়েছে বাঙলা শব্দ উচ্চারণরীতি। আসলে এখানে গোনা হয়, স্বরের সংখ্যা। যত স্বর, ততগুলি মাত্রা। এজন্য এর অন্য নাম স্বরবৃত্ত। ছড়ার ছন্দের পর্বের মাত্রাসংখ্যা সর্বদাই চার।

বষ্টি পড়ে/টাপুর টুপুর, /নদেয় এল, /বান,

শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল, /তিন কন্যা দান।

বা

ঘূম পাড়ানি/মাসি পিসি/মোদের বাড়ি/এসো,

খাট নেই/পালং নেই/

(খুকুর)-চোখ পেতে/বসো।

প্রাচীন কালে অনেক সময় কবি স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্ব মাত্রাসংখ্যা কম বা বেশি করে ফেলতেন। সেক্ষেত্রে গায়কে যেমন সুরের টান করকে প্রসারিত বা বেশিকে সংকুচিত করে নিতেন, আবৃত্তিকারকেও তা করতে হবে। যেমন,

যমুনাবতী/সরস্বতী/কাল যমুনার/বিয়ে-

যমুনা যাবেন/শুশুর বাড়ি/কাজিতলা/দিয়ে।

এখানে দুই চরণের প্রথম দুই পর্বেই বেশি মাত্রা আছে। যমুনাবতীতে পাঁচ মাত্রা আর যমুনা যাবেন—এও পাঁচ মাত্রা। অতএব ‘যমু’কে সংক্ষেপে ‘যম’ করা ছাড়া পথ নেই। দু চরণেই এমনি করে ধ্বনি সংকুচিত করে নিতে হবে।

(খ) ধ্বনি-প্রধান ছন্দ : দ্বিতীয় প্রকার ছন্দের সংক্ষিত ছন্দের প্রভাব বেশি। সংক্ষিত যেমন প্রত্যেক ধ্বনির মাত্রামূল্য সুনির্দিষ্ট, এই ছন্দেও তাই। এই কারণে অনেকে

একে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলেন। কারো মতে, ধ্বনির মূল্য এই ছন্দে এত নিপুণ ভাবে দেওয়া হয়, যা অন্য ছন্দে দেওয়া হয় না, তাই এর নাম হওয়া উচিত ধ্বনি-প্রধান ছন্দ।

বাঙ্গলা উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী দীর্ঘস্বর দুইমাত্রা হয় না। ফলে যে সব কবি, কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ধ্বনি-প্রধান ছন্দ গ্রহণ করেছেন, অথচ দীর্ঘস্বরকে ধরেছেন, সে সব কবিতা পাঠ কালে, বাংলা উচ্চারণরীতি ব্যাহত হলেও ছন্দের খাতিরে ওদের দুইমাত্রাতেই উচ্চারণ করতে হবে। যেমন,

ক) ॥ ॥ ॥ ॥০০০ ০০॥০০॥ ॥ ॥

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসন্ত সবরী বলী

॥ ॥ ০ ॥ ০ ০০০ ০০॥ ০০০ ॥ ০ ॥ ॥ ॥

মোরঙ্গি পীচছ পরহিণ সবরী গিৰত গুঞ্জৱী মাজী

[চর্যাপদ (২৮নং) শবরপাদরচিত]

(খ) ॥০০ ॥০০ ০০০ ০ ॥০

মন্দিৰ বাহিৰ কঠিন ক পাট

০০০০ ॥০০ ॥০০ ॥০

চলইতে শক্ষিল পক্ষিল বাট

[গোবিন্দদাস]

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে যে এখানে বাঙ্গলা স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি ব্যহত হয়েছে। এখানে উচ্চারণরীতি স্বাভাবিক করলে ছন্দপতন অনিবার্য। ফলে এমন কবিতা আবৃত্তি করতে বসলে আবৃত্তিকার ছন্দ বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস না করে উচ্চারণ রীতিকেই খর্ব করবেন। আজকাল এসব কবিতার আবৃত্তির প্রতি বোঁক দেখা যাচ্ছে। আসলে বৈচিত্র্যই সেখানে লক্ষ্য। বৈচিত্র্যের জন্য উচ্চারণের অসুবিধাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

আরও একটা কথা এখানে বলা দরকার। যাঁরা প্রথম অভ্যাস করতে বসেছেন, তাঁদের গলা তৈরী, জিভ এবং মুখমণ্ডলে জড়তা নষ্ট করা অর্থাৎ সঠিক ভাবে স্বরযন্ত্রকে আত্মবশে আনবার জন্য এ জাতীয় কবিতা আবৃত্তি বিশেষে ফলঃপ্রসূ। সেদিক থেকে এই প্রাচীন রীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান কবিতা বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। আধুনিক কবিরা কিন্তু এ ছন্দটিকে স্বাভাবিক উচ্চারণ ভঙ্গির কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। আগের ছন্দ বিশে-ষণগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাব যে দু'ধরনের অক্ষরকে দু'মাত্রা ধরা হয়েছে। এদের কতকগুলি স্বরাত্ম (closed) কতকগুলি ব্যঞ্জনাত্ম (open)। আমরা আজও ব্যঞ্জনাত্মগুলিকে স্বাভাবিক রীতিকে দু'মাত্রা ধরতে পারি। কিন্তু স্বরাত্মগুলিকে দু'মাত্রা ধরি না বা ওভাবে উচ্চারণ করি না। বাঙ্গলায়, সাধারণভাবে, কখনই আ-ই-উ-এ কে দু মাত্রায় উচ্চারণ করা হয় না। এ যন্ত্রণা যে কবি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন, তাঁর ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ ও ছন্দবৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও স্বাভাবিক হয়েছে। বরং তাতে এমন একটা দোলা, সুর ও বৈচিত্র এসেছে যার প্রতি আবৃত্তি প্রেমিকের লোভ অনিবার্য। দু একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

উদাহরণ দেওয়ার আগে আরও একটা কথা বলা দরকার। এ জাতীয় কবিতা আবৃত্তি করতে গেলে সাধারণভাবে একটা সুর চলে আসে। আবৃত্তি করতে গেলে সতর্কভাবে এ সুরটা বর্জন বা যথাসম্ভব বাতিল করা দরকার। আধুনিক কালে বহু প্রতিযোগিতার আসরে দেখছি বিচারকেরাও এই অর্থ ও তাৎপর্যশূন্য সুরকে প্রশংস দিচ্ছেন। এতে আবৃত্তির জাত মারা যায়।

১.

সাগর জলে/সিনান করি/সজল এলো/চুলে

বসিয়েছিলে/উপর-উপ/কূলে।

শিথিল পীত/বাস

মাটির 'পরে/কুটিলরেখা/লুটিল চারি পাশ।

নিরাবরণ/বক্ষে তব/নিরাভরণ/দেহে'

চিকন সোনা/-লিখন উষা/আঁকিয়া দিল/মেহে।

মকরচূড়া/মুকুটখানি/পারি ললাট-/পরে

ধনুক বাণ/ধরি দখিন/করে

দাঁড়ানু রাজ/বেশী

কহিনু, "আমি এসেছি পর/দেশি।"

[সাগরিকা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এই কবিতাটি প্রায় তিন পৃষ্ঠা দীর্ঘ। আমরা এখানে মাত্র একটি স্তবক তুললাম। এই একটি স্তবক আবৃত্তি বা পাঠ করতে গেলেই আবৃত্তিকারের ক্ষমতার অঙ্গ-পরীক্ষা হয়ে যাবে। এখন দুটি মাত্র চরণকে সমস্যার মত তুলে ধরছি। ষষ্ঠ চরণে দেখা যাচ্ছে, যতিপাত সোনা, উষা এবং দিল-র পরে। কিন্তু অর্থভেদের জন্য চিকন সোনা লিখন/উষা/আঁকিয়া দিল মেহে-এইভাবে পাঠ করা দরকার। আবার উদ্ভৃতির শেষ যতিপার হয়েছে 'আমি' এবং 'পর'-এর পর। অর্থভেদের জন্য 'কহিনু'র পরে থেমে "আমি এসেছি-পরদেশী" এইভাবে বলা দরকার। এই বলার ঢং ও যতির তিন্নতর ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে না পারলে আবৃত্তি ব্যর্থ।

ছন্দ জ্ঞান করখানি কাজে লাগে ?

ছন্দ সম্পর্কে এত যে বিশদ আলোচনা করা হ'ল, প্রকৃতপক্ষে, এর খুব সামান্য অংশই আবৃত্তিকারের কাজে লাগে। আবৃত্তিকারকে ছন্দের পরীক্ষা দিতে বসতে হবে না। বরং বহুক্ষেত্রে আবৃত্তিকার ছন্দকে ভাসেন, গড়েন, কবির মাত্রা ও পর্বকে সংকুচিত-প্রসারিত করে নিজের মত করে নেন। আসলে আবৃত্তি ত' কবিতার একটা কঠ্যরূপ মাত্র নয়। আবৃত্তিকার একবার মাত্র উচ্চারণ করে কবিতার ভাব-রসও উপলব্ধিকে শ্রোতার বুকে গেঁথে দিতে চান। এক্ষেত্রে তার দায় কবির থেকে কম নয়। কবি উদাসীন মায়ের মত কবিতাকে জন্ম দিয়ে ছেড়ে দেন। আবৃত্তিকার তার প্রতিটি শব্দের যোগ্য মূল্য নির্ধারণ করে সময় ভাব ও রাত্তকে উপভোগ্য করে তোলেন শ্রোতার কাছে। স্বত্বাতইঃ যেখানে ছন্দের চাইতেও বড় কথা শ্রোতার কাছে এই উপলব্ধির বোধ সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,

‘কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তাহলে সেই প্রগলভতা ছন্দকে ধিক্কার দেবে। মন্তিষ্ঠ, হৃদপিণ্ড পাকস্থলী অতি আশ্চর্য যন্ত্র, সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদের ব্যবহার করে, প্রকাশ করে না। করে প্রকাশ যখন রোগ ধরে; যখন যকৃৎটা হয় প্রবল, তার কাছে মাথা হেঁট করে লাবণ্য। শরীরের স্বাস্থ্যের মতই ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার আপন হয়।’

ছন্দ : বাংলা ছন্দের প্রকৃতি।

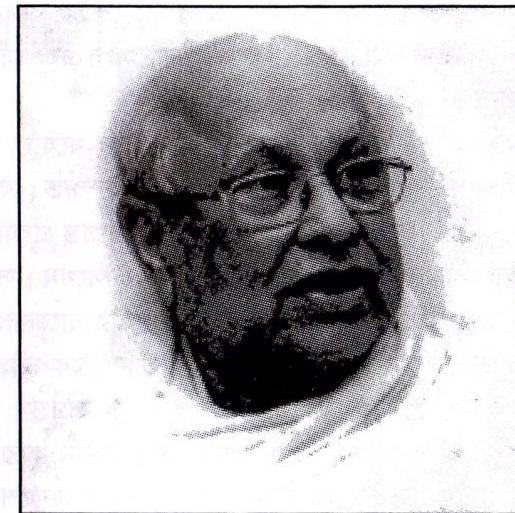
আবৃত্তির ক্ষেত্রেও তেমনি, ছন্দ প্রকট হয়ে দেখা দেবে না। সে থাকবে দেহ যন্ত্রগুলির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে। ছন্দ প্রকট হওয়া অর্থ আবৃত্তিতে রোগ ধরা। ছন্দ তখন আবৃত্তির কঠে বেড়ি-বক্ষন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছন্দ কথাকে ঝরপের দিকে দেয় বক্ষন, তাবের দিকে দেয় মুক্তি। সেতারের বাঁধা থাকে তাই সুরে তার মুক্তি।

“ছন্দ সেই সেতারের বাঁধা তার, সুরের বেগ
কথাকে অত্তরে দেয় মুক্তি।”

আবৃত্তিকার কবিতার কথাকে ছন্দের বক্ষন থেকে সুরের বেগে মুক্তি দেবেন। বড় হয়ে উঠবে কথা-সুর-বেগ। ছন্দ নয়।

লেখকের আবৃত্তিকোষ গ্রন্থ থেকে সংকলিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা - ২০০৫



মাহবুব উল আলম চৌধুরী

একুশের সাড়া জাগানো প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’র জনক মাহবুব উল আলম চৌধুরী সাতাতুর বছর জীবনে নানা বিষয়ে বিভিন্ন আঙিকে বহু কবিতা, গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সম্পাদনা করেছেন পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত প্রথম মর্যাদাবান মাসিক পত্রিকা ‘সীমান্ত’ (১৯৪৭-১৯৫২)। সত্ত্বে দশকে সম্পাদনা করেছেন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ‘দৈনিক স্বাধীনতা’ (১৯৭২-১৯৮২)। দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনীতিকে একই মেল-বন্ধনে মিলিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৭ সালে ৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গহিরা গ্রামে।

১৯৫০ সালে তিনি চট্টগ্রামে দাসাবিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। একান্ন সালে চট্টগ্রাম হরিখোলার মাঠে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সংস্কৃতি সম্মেলনের তিনি অন্যতম সংগঠক। বায়ন্ন সালে চট্টগ্রামের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম

পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। চুয়ান্ন সালে যুক্তফুন্ট কর্মী শিবিরের আহ্বায়ক ছিলেন। একই বছর ঢাকায় কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিকের যে প্রতিনিধি দল যোগদান করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন দলনেতা। তিনি চট্টগ্রামের প্রাণিক নব-নাট্যসংঘ এবং কৃষ্ণ কেন্দ্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা।

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি তাঁর উলে-খযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। চলি-শ এবং পঞ্চাশ দশকে আবেগধারা (চট্টগ্রাম), ইস্পাত (কোলকাতা) এবং অঙ্গীকার (কোলকাতা) নামে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দারোগা ও আগামীকাল নামে তিনি দুটো নাটকও লিখেন। সাতচলি-শ সালে লিখিত তাঁর পুস্তিকা বিপ-ব তন্দনীভন সরকার বাজেয়াশ্চ করেন। ছান্নান সালে মিশরের মুক্তিযুদ্ধ নামে আরো একটি পুস্তক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। সূর্যাস্তের রক্তরাগ তার সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ।

১৯৮১ সালে বাঙলা একাডেমী তাঁকে ফেলোশীপ প্রদান করে সম্মানিত করে। ২০০১ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তাকে একুশে পদক ও সমর্থনা প্রদান করে। এ ছাড়া তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্বর্ণপদকসহ অনেক সমর্থনা লাভ করেন।

ব্যাপক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি চলি-শ এবং পঞ্চাশ দশকে পূর্ব বাংলায় হয়ে উঠেছিলেন একজন কিংবদন্তী পুরুষ।

শুন্মূল উদ্যোক্তাদের উৎসাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

অংশী
Aungshee

বৈমরঞ্চলী উন্নয়ন মৎস্য ইস্যু'র একটি উদ্যোগ

❖ আবাদের বৈশিষ্ট্য ❖

পণ্যের গুণগত মান

সাশ্রয়ী মূল্য

আধুনিক ও রুচিশীল পণ্য

দেশীয় উপকরণ ব্যবহার

বাড়ী # এফ ১০ (পি), নীচ তলা, রোড # ১৩ (চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের রাস্তা)

ব-ক - বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৮২১২

ফোন: ০৩১-৬৭২৮৫৭ মোবাইল: ০১৮-১৭৭৪১৮

ই-মেইল: Aungshee <info@ypsa.org>

Multi Microtech Solution BD Ltd.

www.mmsbd.com

- Bring your business under single roof of MMS
- We Introduce Information Technology in your BIZ without involving your money.

We mean IT

Take A Chance

- ASP Solution For Enterprise
- Corporate Training
- Data Processing
- IT Consultancy

Multi Microtech Solution BD Ltd.



1147/A, CDA Avenue IFCO Complex (6th Floor)
East Nasirabad Chittagong, Bangladesh.
Phone: 031-656913, E-mail: info@mmsbd.com

A Govt. Private Joint Venture

ফুল আকতাব হোসাইন'এর

সন্তুষ্ম কাব্যগ্রন্থ

দরিয়া কাঁদে না
দাঁড়ির আর্তনাদে

প্রচ্ছদ মাঝে
বহিস্মেলা কর
জটিল জটিল
জোয়ানে

স ম্পা দ কী য

চির শান্তির দেশ আমাদের এই
বাংলাদেশ ।

এখনে কোনো সন্ত্রাস নেই,
নেই খুনোখুনি ।

রাজনৈতিক সম্প্রীতি বৈ সহিংসতা কল্পনা
মাত্র । এদেশের আকাশ নীল ।
ভালোবাসায় পূর্ণ এ দেশের মানচিত্রের
প্রতিটি রেখা ।

স্বপ্ন থেকে বাস্তবের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে
ওঠে যখন দেশের বস্ত্রগত ভাবনায়
দু'চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায় ।
নিজেকে ইতর প্রাণি থেকে ভিন্ন মনে হয়
না, যখন ভাবি আমার বোধ হয় কিছুই
করার নেই ।

আমাদের কি কিছুই করার নেই,
স্বপ্নের দেশের উষ্ণ সুখগুলো যে সিন্দুকে
তালাবন্ধ তাকে কি আমরা ছিনিয়ে
আনতে পারি না ?

আসুন আমরা মানুষ হয়ে উঠি । কবিতাকে
সাথে নিয়ে সুখ সিন্দুকের তালা খুলি ।
স্বপ্নকে বাস্তব করার এখনই সময় ।
হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি, চলুন...